

আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ الشُّرْكُ الأصغر – বা ছোট শিরক

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান

আল্লাহ তা‘আলার বড়ত্ব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে তার জন্য অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়

আল্লাহ তা‘আলা সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে বড়। তার প্রতি বড়ত্ব ও মর্যাদা প্রদর্শন করা আবশ্যিক। এমন কিছু শব্দ আছে, যা তার প্রতি সম্মান, মর্যাদা ও বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্যই তার শানে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তাই আল্লাহ তা‘আলার জন্য এসব শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(১) এ কথা বলা যাবে না যে, السلام على الله “আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক”। কেননা সালাম দেয়ার মাধ্যমে একজন মুসলিম আরেক মুসলিমের জন্য দু‘আ করে। সালামের মাধ্যমে মুসলিমের জন্য অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা কামনা করা হয়। আর আল্লাহর কাছেই ইহা প্রার্থনা করা হয়; আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহর কাছে দু‘আ করা হয়; আল্লাহর জন্য নয়। কেননা তিনিই সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী, আসমান-যমীনের সবকিছুই তার হাতে। তিনি প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী। তিনিই সালাম এবং তার নিকট থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা আগমন করে।

সহীহ বুখারীতে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ

“আমরা যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাতে থাকতাম, তখন বলতাম, আল্লাহর উপর তার বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, অমুক অমুকের উপর সালাম এবং অমুক ব্যক্তির উপর সালাম। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর উপর সালাম, এমন কথা বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই সালাম।[১] অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, السلام শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যেসব শব্দের মাধ্যমে দু‘আ করা হয়, السلام তার অন্তর্ভুক্ত। এতে দু‘আ করা এবং সংবাদ প্রদান করা উভয় অর্থই বিদ্যমান রয়েছে। তবে সংবাদ প্রদান করা উদ্দেশ্য হলে কামনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সম্ভাষণ বিনিময় করার সময় এ শব্দ দ্বারা দু‘আ করা ও নিরাপত্তা কামনা করা অর্থই উদ্দেশ্য হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আরো বলেন, সালাম দেয়ার সময় যেহেতু শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা হয় এবং এদুটো বিষয়ই যেহেতু বান্দার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই ইহা কামনা করার সময় আল্লাহ তা‘আলার এমন একটি নাম বাছাই করা হয়েছে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার অর্থ বিদ্যমান। এটি হচ্ছে السلام। আমরা আল্লাহ তা‘আলার এ অতি সুন্দর নামের মাধ্যমে নিরাপত্তা কামনা করি। এটি উচ্চারণ করার মাধ্যমে এক সঙ্গে দু’টি কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথমত: আল্লাহর যিকির করা হয়, দ্বিতীয়ত: তার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়। মুসলিমের এটিই কাম্য হওয়া

চাই।

আরো যেসব শব্দ আল্লাহ তা‘আলার শানে ব্যবহার করা জায়েয নয়, তা হলো এভাবে বলা যে, **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي** **إِنْ شِئْتَ** “হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করো”। সুতরাং আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণার্থে দু‘আ করার সময় দু‘আ কবুল হওয়ার বিষয়টি তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া যাবে না; বরং দৃঢ়তার সাথে দু‘আ করতে হবে।

সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ

“তোমাদের কেউ যেন দু‘আ করার সময় এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও তাহলে আমার উপর রহমত নাযিল করো; বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে দু‘আ করে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই”। [2] মুসলিমের উচিত, বড় আশা নিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া। কেননা আল্লাহ তা‘আলা যা দেন তা কখনো তার নিকট বেশী বলে গণ্য হয় না। দুই কারণে আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করার সময় উপরোক্ত কথা বলা নিষেধ।

(১) আল্লাহ তা‘আলার কাজে তাকে বাধ্য করার কেউ নেই। বরং তিনি যা করেন, তার ইচ্ছাতেই করেন। তিনি বান্দার বিপরীত। কেননা বান্দারা কখনো অপছন্দ সত্ত্বেও কোনো কোনো কাজ করে। তারা কখনো অন্যের ক্ষতির আশঙ্কায় কিংবা অন্যের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় কাজ করে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এমন নন।

(২) বান্দার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দু‘আ করতে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার উপর কাম্যবস্তু ছেড়ে দেয়া প্রমাণ করে যে, আসলে কাম্যবস্তুটি চাওয়ার মধ্যে বান্দার দুর্বলতা রয়েছে এবং তাতে তার আগ্রহ কম। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, বান্দা যা চাচ্ছে, তা পেলে ভালো, অন্যথায় সেটাতে তার কোনো প্রয়োজন নেই। দু‘আর মধ্যে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা প্রমাণ করে যে, বান্দা আল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

উপরে অতিক্রান্ত সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কাছে বড় বড় জিনিস চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। বান্দা যত জিনিসই প্রার্থনা করুক, আল্লাহ তা‘আলার কাছে তা মোটেই বড় নয়। আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে যাই দান করেন, তার কাছে সেটা বড় বলে গণ্য হয় না এবং সেটা দান করা তার উপর মোটেই কঠিন নয়। তার নিকট কোনো কিছুই বড় নয়। যদিও তা সৃষ্টির নিকট বড় বলে বিবেচিত হয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও দান পূর্ণতম এবং তার ধন-ভান্ডার অফুরন্ত। তিনি বড় বড় জিনিস বান্দাদেরকে দান করেন। কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

“তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, হও তখনই তা হয়ে যায়”। [3] (সূরা ইয়াসীন:

৮২)

আরো যেসব শব্দ আল্লাহ তা‘আলার শানে ব্যবহার করা ঠিক নয়, তা হলো আল্লাহর নামে এ বলে শপথ করা যে, তিনি অমুক ভালো কাজটি করবেন না কিংবা তিনি অমুক কাজটি করবেন না অথবা অমুক অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না। এভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে তার অনুগ্রহকে সংকীর্ণ করে দেয়া বৈধ নয়।

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ إِلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ

“এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, কে এ ব্যক্তি, যে আমার নামে কসম করে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি অমুককেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার আমল বাতিল করে দিলাম”। ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[4]

النَّالِيُّ শব্দটি الألية থেকে নেয়া হয়েছে। الألية এর ‘ইয়া’ বর্ণে তাক্বীদ দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ হলো শপথ করা। সুতরাং يَتَأَلَّى অর্থ يحلف (সে শপথ করে)। আল্লাহ তা‘আলার বাণী, مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى “কে এ ব্যক্তি, যে আমার নামে কসম করে?” এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের মাধ্যমে উপরোক্ত পদ্ধতিতে আল্লাহর নামে কসম করার দুঃসাহসিকতা দেখানোর প্রতিবাদ করা হয়েছে।

যে লোকটি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিল, অমুক ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করবেন না, সে আল্লাহর সাথে বেয়াদবী করেছে। সে আল্লাহর উপর অকাট্যভাবে হুকুম লাগিয়ে দিয়েছে যে, তিনি অমুক অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না। সে আল্লাহ তা‘আলার রুবুবীয়াতের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা, নিজের নফ্‌সের প্ররোচনা, স্বীয় আমল নিয়ে গর্ব করার কারণেই এ কথা বলেছে। এ কারণে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলাফল প্রদান করা হয়েছে এবং তার কথার কারণেই অপরাধী লোকটিকে ক্ষমা করা হয়েছে। ঐদিকে নিকৃষ্ট কথার কারণে তার আমল বরবাদ করে দেয়া হয়েছে। অথচ সে একজন ইবাদতকারী বান্দা ছিল।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে এমন কথা বলেছে, যার কারণে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি নষ্ট হয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কথায় ও কাজে আল্লাহ তা‘আলার সাথে আদব রক্ষা করে চলা ওয়াজিব। হাদীছ থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহর উপর বাহাদুরি করা, নফ্‌সের দাস্তিকতা প্রদর্শন করা এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করা হারাম।

আল্লাহ তা‘আলার নামে কেবল তখনই কসম করা হারাম হবে, যখন কসমে তার উপর কোনো বিষয়কে হারাম ও সীমাদ্বন্দ্ব করে দিয়ে এভাবে বলা হবে যে, তিনি তার অমুক বান্দার কল্যাণ করবেন না। তবে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করে এবং তার নিকট থেকে কল্যাণের আশা করে যদি কসম করা হয়, তাহলে জায়েয আছে। হাদীছে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ

“আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছে যে, তারা কেনো বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তা পূরণ করার ব্যবস্থা করেন”।[5]

ঐদিকে জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে জবানের ভয়াবহ আপদ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা থেকে জবানকে হেফাযত করার আদেশ এসেছে। মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ!

وَأَنَا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكَلْتُكَ أَمْكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى

مَنَّاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنِّتِهِمْ

“আমরা জবান দিয়ে যেসব কথা বলি, তার জন্যও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, হে মুআয! আফসোস তোমার জন্য। লোকদের জবানের অসংযত কথা-বার্তাই তাদেরকে নাক এবং মুখের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে”। [6] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর সেটাকে সহীহ বলেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, কথা-বার্তায় সংযমী হওয়া আবশ্যিক এবং যেসব কথার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার শানে বেয়াদবী রয়েছে, তা থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। কেননা এ জাতীয় কথা মানুষের আকীদা নষ্ট করে ফেলে এবং তাওহীদে ঘাটতি আনয়ন করে।

সুতরাং السلام على الله বলা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলাই সালাম। কেননা কাউকে সালাম দেয়া মানে তার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দু‘আ করা। আল্লাহর কাছেই দু‘আ করা হয়, তার জন্য নয়। এ কথাও বলা যাবে না যে,

اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت

“হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর রহম করো। অনুরূপ অন্যান্য বাক্যও ব্যবহার করা যাবে না”।

বরং প্রত্যেক দু‘আ দৃঢ়তার সাথে কবুলের আশা নিয়ে করতে হবে। কবুল করা বা না করার বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে হবেনা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেকটি কাজ নিজ ইচ্ছায় সম্পন্ন করেন। তার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সেই সঙ্গে আল্লাহর নামে শপথ করে বলা যাবে না যে, তিনি অমুকের উপর রহম করবেন না কিংবা অমুককে ক্ষমা করবেন না। কেননা এরূপ কথা বিপদজনক এবং আল্লাহর রহমতকে আটকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ও তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করার অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপ ما شاء الله و شاء فلان “যা আল্লাহ চান এবং অমুক যা চায়” বলাও বৈধ নয়। বরং বলা উচিত ما شاء الله ثم شاء فلان “আল্লাহ যা চান অতঃপর অমুক যা চায়”।

কেননা واو দ্বারা একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের উপর আতফ করলে তথা দু‘টি শব্দের মাঝখানে واو আনয়ন করলে এর দ্বারা দু‘টি বস্তুকে সমান করে দেয়া উদ্দেশ্য হয়।

আর কেউ কোনো বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার সাথে সমান নয় কিংবা তার সমকক্ষ কেউ নেই। واو এর বদলে ثم দ্বারা আতফ করা হলে কোনো দোষ নেই। কেননা ثم শব্দটি একই সঙ্গে ধারাবাহিকতা ও বিলম্বের অর্থ প্রদান করে। সুতরাং উপরোক্ত পদ্ধতি বর্জন করে যদি বলা হয়

ما شاء الله ثم شاء فلان

“আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে”, তাহলে বুঝা যাবে যে, আল্লাহর ইচ্ছার পর বান্দার ইচ্ছা হয়েছে। এভাবে বললে কোনো অসুবিধা নেই। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার অনুগামী এবং আল্লাহর ইচ্ছার পরেই বান্দার ইচ্ছা কার্যকর হয়ে থাকে।

বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অংশগ্রহণকারী নয়। কেননা গঠনের দিক থেকে ثم শব্দটির মাধ্যমে দু‘টি বিষয়কে একত্রিত করা উদ্দেশ্য হলেও তাতে সময়ের ব্যবধান থাকে। বান্দার ইচ্ছা আর আল্লাহর ইচ্ছা সমান হওয়া তো দূরের কথা; আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার ইচ্ছার কল্পনাও করা যায়না।

উপরোক্ত বিষয় থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুসলিমদের সহীহ আকীদা জানা আবশ্যিক। যেসব জিনিস আকীদাকে সংশোধন করে এবং যা আকীদা নষ্ট করে ফেলে তাও ভালোভাবে জানা আবশ্যিক। এতে দীনের ব্যাপারে সে সুস্পষ্ট ধারণার উপর থাকতে পারবে এবং না জানার কারণে কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হবেনা। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে উপকারী ইলম এবং সং আমলের তাওফীক দাও।

[1]. সহীহ বুখারী হা/৬৩২৮, অধ্যায়: সালাতে দু‘আ করা।

[2]. বুখারী, অধ্যায়: দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দুআ করবে, হাদীছ নং- ৬৩৩৯।

[3]. ইরাদায়ে কাদরীয়া তথা আল্লাহর যেই ইচ্ছা কোনো কিছু সৃষ্টি করার সাথে সম্পৃক্ত, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। ইরাদায়ে কাদরীয়ার অপর নাম ইরাদায়ে কাওনীয়া। এতে আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসার সম্পর্ক নেই। যেমন আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়ার দ্বারা তিনি কুফরী ও পাপাচার সৃষ্টি করেছেন। অথচ তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য এটি পছন্দ করেন না। অপর পক্ষে ইরাদায়ে শরঈয়ার সাথে পছন্দ ও ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যেই ইচ্ছার দ্বারা শরীয়াতের আদেশ করেন, তার সাথে পছন্দ ও ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি যেই কাজকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, স্বীয় বান্দাকে তাই আদেশ করেছেন। তবে ইরাদায়ে শরঈয়া কখনো বাস্তবায়ন হয় আবার কখনো তা বাস্তবায়ন হয় না। মুমিনের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া ও শরঈয়া উভয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর পক্ষে আল্লাহ তা‘আলা যেখানে কাফেরকে ঈমান আনয়নের আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু কাফের ঈমান আনয়ন করেনি, সেখানে আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়ার বাস্তবায়ন হয়েছে, শরঈয়া বাস্তবায়ন হয়নি। যদিও তিনি ঈমানকে পছন্দ করেন এবং কুফরীকে অপছন্দ করেন।

[4]. সহীহ মুসলিম ২৬২১।

[5]. সহীহ বুখারী ২৭০৩, সহীহ মুসলিম ১৬৭৫, ইবনে মাজাহ ২৬৪৯, আবু দাউদ ৪৫৯৫, মুসনাদে আহমাদ।

[6]. সহীহ: তিরমিযী ২৬১৬।